মূলপাতা

লাভ এট ফার্স্টসাইট

Shihab Ahmed Tuhin

2020-02-13 22:13:58 +0600 +0600

15 MIN READ

“The moment I saw her, a part of me walked out of my body and wrapped itself around her. And there it still remains.”

খুব বিখ্যাত একটি বইয়ের দুইটি লাইন। লেখিকা এখানে যেটার কথা বলছেন ইংলিশে সেটাকে বলে ‘Love at first sight’. সোজা বাংলায় প্রথম দেখায় কিছু চিন্তা না করেই প্রেমে পড়া। ছেলেটার ঠিক তা-ই হলো। সে প্রথম দেখায় ক্রাশ খেলো। অবশ্য ক্রাশ খাবার কারণ কিন্তু যথেষ্ট। কোমর পর্যন্ত ঢেউ খেলানো চুলের অধিকারী মেয়েটা যখন সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, চোখ ফেরানো বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ইশ, কি মায়াবী মুখ! এমন একটা মুখের দিকে তাকিয়েই তো সারাটা জীবন পার করে দেয়া যায়। ছেলেটা হঠাৎ আবিষ্কার করে এই একজন সামনে আসলেই সে প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে যায়। হার্ট খুব দ্রুত বিট করা শুরু করে। এমনকি নার্ভাসনেসের কারণে তার হাঁটুও কাঁপতে থাকে।

ছেলেটা বুঝতে পারলো এই মেয়েকে ছাড়া তার পক্ষে বাঁচতে পারা সম্ভব না। যে করেই হোক তাকে তার পেতেই হবে! অনেক কষ্টে সে মেয়েটার ফোন নাম্বার জোগাড় করে। চেষ্টা করে মেয়েটার হৃদয়ে একটু হলেও জায়গা করে নিতে। কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই রাজি হয় না। তবুও সে চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিছু সময় চলে যায়—

এক মাস।

দুই মাস।

তিন মাস।

মানবচরিত্রের আজন্ম প্রকৃতি একসময় তাদেরকে একে অপরের দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য করে। জীবন সম্পর্কেপ্রচণ্ড উদাসীন ছেলেটাও হুট করে জীবনে নতুন এক প্রেরণা খুঁজে পায়। অসম্ভব শান্তি লাগে তার অপরপাশে মিষ্টি গলাটা শুনতে পেরে। সারা রাত কথা বলার পরেও তার মনে হয় রাতটা এত দ্রুত শেষ হয়ে গেলো কেন? মনে হয় যেন নিজ ঘরে না আলাদা কোনো এক জগতে তারা এক সাথে কথা বলছে অনেকটা উপন্যাসের লাইনের মতো—

"like I was not in my room and he was not in his, but instead we were together in some invisible and tenuous third space that could only be visited on the phone.”

আবারো কিছু সময় খুব দ্রুতই কেটে যায়।

এক বছর।

দুই বছর।

তিন বছর।

এরপর ছেলেটা হঠাৎ করে আবিষ্কার করে আকর্ষণে কেন যেন ভাটা পড়ে গেছে। আগের মতো আর তার মেয়েটাকে দেখলে হার্ট দ্রুত বিট করে না। হৃদয়ের সেই প্রশান্তিও কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। মেয়েটাও বুঝতে পারে সবকিছু আর আগের মতো নেই। মনোমালিন্য শুরু হয়। একসময় সবকিছু শেষ হয়ে যায়। খুব বিষন্ন কিছু দিন কাটে। তারপর? তারপর আবার ছেলেটার

চোখে নতুন কাউকে ভালো লাগতে শুরু করে। তারপর আবার ...।

* * *

আমাদের চারপাশে হওয়া প্রায় ৯০ ভাগ বিয়ে-পূর্ববর্তী রিলেশনের একটা কমন গল্প বলার চেষ্টা করলাম এতক্ষণ। বেশিরভাগ সময়েই সম্পর্কগুলো বিয়ে পর্যন্ত পূর্ণতা পায় না। আর বিয়ে পর্যন্ত গড়ালেও আবেগের সাথে সাথে যখন সীমাহীন দায়িত্ব এসে ভর করে, তখন আবেগগুলো ফিকে হওয়া শুরু করে। 'আমি ওর মন পড়তে পারি'—এমন দাবি করা প্রেমিকযুগল বিয়ের পর আবিষ্কার করে সম্পূর্ণ নতুন আরেকজনকে। এ কারণেই হয়তো 'Love Marriage'-গুলোতে ডিভোর্সের হার অস্বাভাবিক রকমের বেশি। প্রফেসর ইসমাইল আবদুল বারির একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যারা বিয়ের আগে প্রেম করে, বিয়ের পর তাদের ৭৫% এর ক্ষেত্রে সম্পর্কটার শেষ হয় ডিভোর্সের মাধ্যমে। অন্যদিকে, আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে যারা এ হারাম কাজ থেকে বিরত থাকে, তাদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা অনেক কম। কেবল ৫%। কেন এমন হয়?

শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ (হাফি) তার উত্তরে বলেন,

"একজন আরেকজনের সাথে ডেটিং করে, একা সময় কাটিয়ে, চুমু খেয়ে আরো অন্যান্য হারাম কাজ করার পর যে বিয়ে হয়, সে বিয়ে কখনোই সুখের হবে না। কারণ, তারা আল্লাহ্‌র বেঁধে দেয়া সীমা লঙ্ঘন করেছে। তাদের সম্পর্কের ভিত্তি হয় পাপের মাধ্যমে। আর পাপ মানুষের জীবনের বরকত কমিয়ে দেয়। আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য কমিয়ে দেয়।"

প্রেমের বিয়ে ভাঙ্গার পেছনে শায়খ বেশ কয়েকটি কারণও উল্লেখ করেছেন—

১। বিয়ের আগে সাধারণত আরেকজনের দোষ ধরা পড়ে না। খালি ভালোটাই নজরে আসে। তাকে আমরা সবসময় সাজানো-গোছানো অবস্থায় দেখি। তার গা থেকে পারফিউমের সুন্দর ঘ্রাণ আসে। সারাদিন ক্লাস শেষে তার সাথে কথা বললে মন ভালো হয়ে যায়।

কিন্তু বিয়ের পর উল্টো পিঠটা নজরে আসে। তার অগোছালো দিকটাও আমরা দেখতে পাই। তার গা থেকে শুধু পারফিউম না, ঘামের গন্ধটাও পাওয়া যায়। সারাদিন কাজ করে কোন কথা না বলে যখন সে বিছানায় নাক ডেকে ঘুমায়, তখন তার সাথে বিয়ের আগের মানুষটাকে মেলানো যায় না। এ জন্য আরবিতে একটি প্রবাদ আছে—

وعين الرضا عن كل عيب كليلة

"সব প্রেমিকের চোখ অন্ধ হয়ে যায়।"

আর একসময় চোখ খুলে যায়। তবে বড্ড দেরি হয়ে যায়।

২। এরা স্বপ্নের জগতে থাকে। বিয়ের পর এই করবো, সেই করবো। কিন্তু যখন বিয়ের পর জীবনে নানা সমস্যা আসতে শুরু করে, তখন স্বপ্ন ভঙ্গের সাথে সাথে তাদের বিয়েটাও ভেঙ্গে যায়।

৩। বিয়ের আগে সাধারণত ঝগড়া-তর্কএসব কম হয়। ব্রেকআপের ভয়ে অনেক উদ্ভট যুক্তিও অপরপক্ষ মেনে নেয়। কিন্তু বিয়ের পর তা আর সম্ভব হয় না। তখন কথার বদলে পাল্টা কথা হয়। একসময় তা ভয়াবহ ঝগড়ায় রূপ নেয়। সম্পর্কগুলো ভেঙ্গে দেয়।

৪। আমাদের সবার ভেতরই দুইটি সত্তা থাকে। ভালো আর খারাপের মিশ্রণ থাকে। প্রেমের সময় শুধু ভালো দিকটাই নজরে আসে। কারণ শয়তান তখন এই হারাম বিষয়টাকে বিউটিফাই করে থাকে বেশি করে। কিন্তু বিয়ের পর যখন অপর দিকটা সামনে আসে তখন তা আর আমরা মেনে নিতে পারি না।

মোটকথা, প্রেম করে যে বিয়ে করা হয় তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না। তাই এতে আল্লাহর কোনো রহমত থাকে না। প্রথম প্রেম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত পাশে থাকার যে ফ্যান্টাসি সমকালীন সাহিত্যে দেখানো হয়, তা কেবল উপন্যাস কিংবা রূপালী পর্দাতেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে। 'কাছে আসার গল্প'-গুলোতে দূরে সরে যাবার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি।

* * *

তাই আজ আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কাছে আসার গল্প বলবো।

আমাদের গল্পের নায়ক মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সা)। ধীর-স্থির যুবক। চাচার ঘরে মানুষ হয়েছেন। সমাজের কলুষতা থেকে দূরে নির্জনে থাকতেই বেশি পছন্দ করেন। প্রচণ্ড সৎ ও সত্যবাদী হবার কারণে সবাই তাঁকে 'আল-আমিন' নামে ডাকে। সম্ভবত এ কারণেই তিনি সে সময়ের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যবসায়ী খাদিজার (রা) চোখে পড়েন। তিনি মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর হয়ে ব্যবসা করার জন্য প্রস্তাব পাঠান।

মুহাম্মদ (সা) এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তিনি খাদিজার (রা) দাস মাইসারাহ ও পণ্যসামগ্রী নিয়ে সিরিয়ার পথে রওনা দিলেন। সিরিয়ায় পৌছে তিনি গির্জার কাছে এক গাছের নিচে বিশ্রাম নিলেন। তখন গির্জা থেকে এক পাদ্রী বের হয়ে মাইসারাহকে জিজ্ঞেস করলেন, "গাছটির নিচে যিনি বিশ্রাম নিচ্ছে উনি কে?" মাইসারাহ বললেন, "তিনি হারামের অধিবাসী।" পাদ্রী তখন বললেন, "এই গাছে নবি ছাড়া আর কেউ কখনো বিশ্রাম নেয়নি।"

সে খুব অবাক হয়ে আরো দেখতে পেলো দুজন ফেরেশতা দুপুরের তীব্র রোদে মুহাম্মদ (সা)-কে সবসময় রক্ষা করে চলছেন। অলৌকিক এই ঘটনা আর পাদ্রীর ঐ কথাটি সিরিয়া থেকে ফিরে মাইসারাহ খাদিজা (রা)-কে অবহিত করে। ঘটনাটি খাদিজার (রা) মনে দাগ কাটে। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফলকে, যিনি ছিলেন সে সময় তাওরাত ও ইঞ্জিলের একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত, পাদ্রীর কথাটি জানান। সব শুনে ওরাকা বললেন,

"খাদিজা! এসব ঘটনা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, মুহাম্মদ এ উম্মাতের নবি। আমি জানতাম, তিনিই হবেন এ উম্মাতের প্রতীক্ষিত নবি। এটা সে নবিরই যুগ।"

ওরাকার এ কথা খাদিজা (রা)-কে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। এদিকে ব্যবসাতেও মুহাম্মদ (সা) রেকর্ডপরিমাণ লাভ করে আসেন। মুহাম্মদ (সা)-এর সততা তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি মুহাম্মদ (সা)-কে বিয়ে করতে আগ্রহবোধ করেন। বাংলাদেশের কিছু বিজ্ঞানমনস্ক(!) লেখকরা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, রাসূল (সা) সম্পদের লোভে খাদিজা (রা)-কে বিয়ে করেছিলেন। অজ্ঞ (নাকি মিথ্যুক?) লোকগুলো এ কথা কখনোই বলবে না, ব্যবসা এবং বিয়ের প্রস্তাব কিন্তু খাদিজা (রা) স্বয়ং রাসূল (সা)-কে দিয়েছিলেন। চাচা আবু তালিবের সাথে পরামর্শ করে মুহাম্মদ (সা) বিয়েতে রাজি হন। তখন তাঁর বয়স ছিলো ২৫ আর খাদিজা (রা)-এর বয়স ছিলো চল্লিশ। কিন্তু বেঁকে বসেন খাদিজা (রা)-এর পিতা। বেশ মজার একটা উপায়ে তিনি বাবাকে রাজী করালেন।

খাদিজা (রা) কিছু খাবার ও পানীয় প্রস্তুত করে তাঁর পিতা ও কুরাইশদের কয়েকজনকে দাওয়াত দেন। খাবার ও পানীয় গ্রহণ করে সবাই নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তারপর তিনি তাঁর পিতাকে বললেন, "মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। আমাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়ে দাও।" তখন তিনি খাদিজা (রা)-কে মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। খাদিজা তাঁর পিতাকে হুল্লা (বিশেষ পোষাক) পরিয়ে সুগন্ধী মেখে দেন। সে সময়ের লোকজন বিয়ের সময় বাবাকে এমন পোশাক পরিয়ে সুগন্ধী লাগিয়ে দিতো। এদিকে নেশার ঘোর কেটে যাবার পর তাঁর পিতা দেখেন, তার গায়ে সুগন্ধী ও হুল্লা! এসব দেখে তিনি বলে উঠেন, "আমার এ কী অবস্থা! এসব কী!" খাদিজা (রা) তখন বললেন, "তুমি আমাকে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে বিয়ে দিয়েছো।" তাঁর পিতা বললেন, "আবু তালিবের অনাথ ভাতিজার সাথে আমি (মেয়ে) বিয়ে দেবো! না, তা হবে না।" খাদিজা (রা) বললেন, "কী লজ্জার কথা! তুমি নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলে—লোকদের এ কথা বলে কি কুরাইশদের নিকট তুমি

নিজেকে নির্বোধ প্রমাণ করতে চাচ্ছো?” এ কথা বলতে থাকায় একসময় তিনি রাজী হয়ে যান।”

ঘটনাটি পড়ে অনেকের মনে হতে পারে, খাদিজা (রা) আগ্রহের আতিশয্যে এমনটা করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পরে কি খাদিজা (রা)-এর মোহ কাটতে শুরু করেছিল? না, ঘটনাটি আমাদের বর্তমান সময়ের মতো এগোয়নি। বরং তাঁর মুগ্ধতা বহুগুণে বেড়েছিলো। মুহাম্মদ (সা) খাদিজা (রা)-এর সম্পদের কোনো অপব্যবহার না করে আগের মতোই সাদা-সিধে জীবনযাপন করতে থাকেন। বিয়ের পর মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কেখাদিজা (রা)-এর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি নবুওয়্যাতের ঘটনা থেকে। মুহাম্মদ (সা) যখন প্রথম ওহীপ্রাপ্ত হন এবং জীবনের আশঙ্কা করে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে প্রবেশ করেন, তখন খাদিজা (রা) তাঁকে বস্ত্রাবৃত করে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছিলেন,

“আল্লাহ্‌র কসম, কক্ষনো না। আল্লাহ্ আপনাকে কক্ষনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন। নিঃস্বকে সাহায্য করেন। মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।”

রাসূল (সা) আর খাদিজা (রা) এতটাই পরিপূরক ছিলেন যে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি দ্বিতীয় কোন বিয়ে করেননি। ইবরাহীম (রা) ব্যতীত রাসূল (সা)-এর সকল সন্তান-সন্ততি খাদিজার (রা) গর্ভেই হয়েছিলো। খাদিজার (রা) মৃত্যু রাসূলকে (সা) এতটাই ব্যথিত করে যে, তিনি যে বছর মারা যান, সে বছরকে সীরাতকাররা عام الحزن বা ‘বিষন্নতার বছর’ নামে অভিহিত করেছেন।

রাসূলের (সা) ভালোবাসা আমাদের ভালোবাসার মতো ঠুনকো ছিল না। তাই মৃত্যুর পরেই তা শেষ হয়ে যায়নি। পরবর্তীতে দ্বীনের স্বার্থে ও ওহীর ইশারায় তিনি বেশ কয়েকটি বিয়েতে আবদ্ধ হন। কিন্তু খাদিজা (রা) সবসময়ই তাঁর স্মৃতিতে অমলিন ছিলেন। যখনই তাঁর সামনে খাদিজা (রা)-এর নাম স্মরণ করা হতো, তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে যেতো। তিনি তাঁর জন্য দু’আ করতেন। অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন। আল্লাহ্ তা’আলার কাছে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। গভীর আবেগে বলতেন—

إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا

“(আল্লাহ্ তা’আলাই) আমার অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা গেঁথে দিয়েছেন।”

খাদিজার (রা) মৃত্যুর পর একবার তাঁর বোন হালাহ (রা) রাসূলে (সা)-এর সাথে দেখা করতে আসলেন এবং ভেতরে প্রবেশ করতে অনুমতি চাইলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অনেকটা খাদিজার (রা) মতোই। সে স্বর শুনেই রাসূল (সা)-এর খাদিজার (রা) কথা মনে পড়ে গেলো। তিনি বললেন, “হে আল্লাহ্! এটা যেন হালাহ হয়।” আয়েশা (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এ কথা শুনে তাঁর মনে ঈর্ষার উদয় হলো। তিনি বললেন, “আপনি এখনো কুরাইশের সে দাঁত পড়ে যাওয়া বৃদ্ধার কথা স্মরণ করেন! তিনি তো অনেক আগেই মারা গিয়েছেন আর আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর চেয়ে উত্তম কাউকে দিয়েছেন।” রাসূল (সা) তখন প্রচণ্ড রেগে গেলেন। বললেন, “আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা’আলা আমাকে তার চেয়ে উত্তম বদলা দেননি। মানুষ যখন আমার উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিলো, তখন সে আমার উপর ঈমান এনেছিলো। যখন সবাই আমায় মিথ্যাবাদী বলেছে, তখন সে আমাকে সত্যবাদী বলেছে। যখন সবাই আমাকে বঞ্চিত করেছে, তখন সে আমাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে। আর তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ্ আমাকে সন্তান দান করেছেন।”

খাদিজা (রা)-এর মৃত্যুর পর রাসূল (সা) তাঁর বান্ধবীদের উপহার পাঠাতেন। এমনকি তিনি যদি জানতেন কেউ খাদিজা (রা)-কে পছন্দ করে, তাকেও তিনি উপহার পাঠাতেন। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, “রাসূল (সা) যখন কোন উপহার পেতেন, তিনি বলতেন, ‘যাও এটা ওমুকের কাছে নিয়ে যাও। কারণ, সে খাদিজার বান্ধবী ছিলো। আর এটা ওমুকের কাছে নিয়ে যাও। কারণ, সে খাদিজাকে পছন্দ করতো।”

নবি (সা) যখনই কোন ছাগল জবাই করতেন, তখন খাদিজার (রা) ভালোবাসার স্মরণে সে ছাগলের গোশত খাদিজা (রা)-এর বান্ধবীদের উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন। কাউকে খুঁজে না পেলে মদিনার পথে পথে খাদিজা (রা)-এর বান্ধবীদের খুঁজে

বেড়াতেন। আয়েশা (রা) তাই একদিন রাসূল (সা)-কে অভিমানের সুরে বললেন, “মনে হয় খাদিজা ছাড়া দুনিয়াতে কোন নারীই নাই!” রাসূল (সা) তখন বললেন, “সে তো এমন আর এমন ছিলো (বলে তিনি খাদিজা (রা)-এর প্রশংসা করতে লাগলেন)। আর তাঁর গর্ভেআমার সন্তানেরা জন্মেছিলো।”

একদিন রাসূল (সা)-এর কাছে বৃদ্ধ এক মহিলা এলো। রাসূল (সা) তার পরিচয় জানতে চাইলে সে বললো, “আমার নাম জাসসামাতুল মুজানিয়া।” রাসূল (সা) বললেন, “বরং আপনি হচ্ছেন হুসসানা। আপনি কেমন আছেন? আপনার লোকজনদের খবর কী? আপনার দিনকাল কেমন চলছে? আপনাকে শেষবার যখন দেখছিলাম তারপর থেকে আপনার অবস্থা এখন কেমন?” তিনি জবাবে বললেন, “হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা ও মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আমরা ভালো আছি।” মহিলাটি চলে যাবার পর আয়েশা (রা) রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এতো আদরতা ও মায়ার সাথে এ বৃদ্ধার সাথে কেন কথা বললেন?” রাসূল (সা) জবাব দিলেন, “আয়েশা! যখন খাদিজা বেঁচে ছিলো, তখন সে প্রায়ই আমাদেরকে দেখতে আসতো।”

বদর যুদ্ধে বন্দীদের মধ্যে ছিলেন রাসূল (সা)-এর জামাই আবুল আস। তিনি রাসূল (সা)-এর কন্যা যায়নাবের (রা) স্বামী ছিলেন। মুক্তিপণ হিসেবে যায়নাব (রা) নিজ গলার হার স্বামীর জন্য পাঠিয়ে দেন। এ হার খাদিজা (রা) যয়নাবের (রা) বিয়ের সময় নিজের গলা থেকে খুলে দিয়েছিলেন। রাসূল (সা) এ হার দেখে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। তাঁর চোখ পানিতে ভিজে গেলো। তিনি সাহাবিদের বললেন, “তোমরা যদি রাজি থাকো, তাহলে এই হার ফিরিয়ে দাও এবং পণ ছাড়াই বন্দীকে মুক্ত করে দাও।”

* * *

আমাদের বর্তমান সময়ে বিয়ের একটা প্রধান কারণ থাকে সাময়িক মোহ ও উদাম যৌনতা। ৪০ বছরের একজন প্রৌঢ়ার সাথে ২৫ বছরের এক যুবকের বিয়েতে এসবের কিছুই ছিলো না। ছিলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং পারস্পরিক চিরস্থায়ী মুগ্ধতা। তাহিরা ও আল-আমিনের ভালোবাসা তাই একজনের মৃত্যুতেই শেষ হয়ে যায়নি।

হুজুররাও কিন্তু প্রেমের গল্প লিখে যায়। তবে সে গল্প লেখা হয় নীরবে। সে গল্প দেহের ভাঁজ দেখে আকৃষ্ট হওয়া নিয়ে শুরু হয় না। সে গল্পে চোখাচোখি নেই। সে গল্পের জুটিরা নীল রঙয়ের শাড়ি আর হলুদ পাঞ্জাবী পড়ে রাস্তায় হাত ধরে হাঁটে না। নামীদামী রেস্তোরায় সেলফি তুলে চেক ইন দেয় না। সে গল্প সবার চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না। তাই এদের নিয়ে কোনো ‘কাছে আসার গল্প’ লিখা হয় না।

* * *

বড্ড নীরস গল্প, তাই না? এ গল্পে যে কিছুই নেই!

হ্যাঁ, আসলেই কিছু নেই। এ গল্পে সাময়িক মোহ কেটে যাবার পর মনোমালিন্য নেই। এ গল্পে অবিশ্বাস নেই। সন্দেহ নেই। নতুন কাউকে পাবার পর কমিটমেন্ট ভেঙ্গে ফেলা নেই। এ গল্পের জুটিরা একে অপরকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করে না। এ গল্পের নায়িকারা এবোরেশান করতে না পেরে লোকলজ্জার ভয়ে সুইসাইড করে না। সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানকে রাস্তায় ধুঁকে ধুঁকে মরবার জন্য ফেলে আসে না। এ গল্পের হিরোরা হতাশা ঠেকাতে নেশা শুরু করে না। মেয়ের দেহ ভোগের পর তাকে ডাস্টবিনে ফেলে দেয় না। মেয়েদেরকে পণ্য হিসেবে দেখে না।

এ তো সব না আর না। তাহলে এই গল্পে কী আছে? কিছুই কি নেই?

আছে, থাকবে না কেন? আছে সততার মুগ্ধতা। বিপদে আশার বাণী। আছে একে অপরের প্রতি আত্মবিশ্বাস। আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস। কারণ, এ ভালোবাসা তো আল্লাহর জন্যই।

কিশোর বয়সে আমি মনে করতাম হুজুরদের জীবন ভালোবাসাশূন্য। প্রেমহীন। কিন্তু এখন আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি পৃথিবীর

শ্রেষ্ঠতম ও পবিত্রতম ‘লাভ স্টোরি’ হুজুররাই লিখে গিয়েছে। আমরা বর্তমান প্রজন্ম স্বল্প আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে অধিক আলোতে অন্ধ হয়ে যাই। এ কারণেই হয়তো রোমিও-জুলিয়েট নিয়ে হাহাকার করা প্রজন্ম খাদিজা (রা)-মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে কিছুই জানে না।

আমাদের বর্তমান প্রজন্মের ভালোবাসা ‘আনা উহিব্বুকি’ (আমি তোমাকে ভালোবাসি)-তেই শেষ হয়ে যায়, সেখানে ‘ফিল্লাহি’ (আল্লাহর জন্যে) কথাটি থাকে না। মহান আল্লাহ তা’আলা এসব চোখ-ধাঁধানো অথচ অন্তঃসারশূন্য প্রেম-ভালোবাসা থেকে আমাদের দূরে রাখুক।

আল্লাহ্ সুবহানু তা’আলা আমাদের সেই পবিত্র ভালোবাসার সাথে যুক্ত করুন, যে ভালোবাসা কখনো হারিয়ে যায় না। মরেও যায় না। যে ভালোবাসার কণ্ঠস্বর মৃত্যুর পরেও আবেগতাড়িত করে।

যে ভালোবাসার কারণেই স্ত্রী গভীর রাতে একসাথে তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য স্বামীর মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। অসম্ভব সুন্দর একটা তারাভরা রাতে গভীর মমতায় আর্দ্র এক কণ্ঠ বলে উঠে—

“আনা উহিব্বুকি ফিল্লাহ।”